International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-VI, November 2023, Page No.01-11
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i3.2023.01-11

সমকালীন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অভিঘাত: ধর্মমঙ্গল কাব্যের নির্মাণ প্রসঙ্গ

অরিন্দম অধিকারী

সহকারী অধ্যাপক, মানকর কলেজ, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

The history of the emergence of medieval literature was associated with changes in Islamic dynasty. Medieval literature began when the period of Muslim rule began. As time progressed, the form of the ruler changed. There has also been a change in literature. As the time of beginning of Muslim rule, The God Manasa in 'Manashamangal' poetry was very angry and revengeful. She knows how to protect her devotee from ruler. In the changing of time, God Chandi in 'Chandimangal' poetry become quiet. She was not so much vindictive as like Manasa. After that 'Dharmamangal' poetry began to be written at the end of the middle Ages. During the Nawabi rule in the 18th century, the economic structure of Bengal underwent radical changes. Zamindari system was changed in the time of Nawabab Murshidkuli . In the second half of this century, the rule of the East India Company began. In this time period Famine started in Bengal due to company's exploitation in 1770's. People die without food in this famine. In such situation, people's religious life was changed. This is also reflected in literature. 'Dharmamangal' and 'Shivayan' poetry were written anew in this changing time period. Also social and religious life of contemporary people comes up in poetry. Poets depict the history of change in and social life of peoples in their poetry.

Keywords: Nawabi Period, East India Company, Famine, Purana, Manikram Ganguly, Ghanaram Chakraborty, Women's Independence, Religious life, Ramayana, Mahabharata, Lausen, Kanarah, Lakhai Domni, Kalu Dom.

মধ্যযুগের ধর্মীয় ইতিহাস প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে ছিল সমকালের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের ক্রম উত্থান-পতনের সঙ্গে। এই যুগের সাহিত্য রচনার শুরুতে ধর্মগত ভাবে শাসকের বদল ত্বরান্বিত করেছিল মধ্যযুগের সাহিত্য রচনায়। মুসলমান শাসনের সময়কাল যত এগিয়েছে পরিবর্তন হয়েছে শাসকের রূপ। বহিরাগত তকমা ছেড়ে শাসক হয়ে উঠেছে বাঙালি। কমেছে আক্রমণকারী বিন বখতিয়ার খিলজির সময়ের শাসকের ক্রোধ ও অত্যাচার। এই বদল প্রভাব ফেলেছে সাহিত্যের নির্মাণের ক্ষেত্রে। শাসকের শাসনের ধার কমার সঙ্গে সঙ্গে কমেছে মনসার তুলনায় চণ্ডীর ক্রোধ। শুরু হয়েছে বাঙালির রামায়ণ ও মহাভারত সাধনা। ধীরে ধীরে পুরাণ ও পৌরাণিক সংস্কৃতি জাঁকিয়ে বসেছে সমাজ ও সাহিত্যে। লোকসমাজে পূজিত দেবতার কাহিনিতে প্রবেশ করেছে পুরাণ প্রসঙ্গ ও পৌরাণিক কাহিনি। সময় যত এগিয়েছে এই প্রবণতা ক্রমশ বেড়েছে।

সতেরো শতকের শেষ অথবা আঠারো শতকের শুরু থেকে পুনরায় রাষ্ট্রীয় পালাবদলের সূচনা হলে সমাজে ধর্মীয় অবস্থানের পালাবদলের সূচনা হয়। যার প্রভাব পড়েছে সেই সময়ের সাহিত্য রচনায়।

সতেরো শতকের শেষ থেকেই পটভূমি তৈরি শুরু হয় রাষ্ট্রীয় পালাবদলের। আঠারো শতকের শুরুতেই এই রাষ্ট্রীয় পট পরিবর্তনের আয়োজন শুরু হয়ে যায়। সময়টা ছিল ক্রমাগত রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা ও শাসকের নীতির বদলে ভারাক্রান্ত। প্রথমার্ধে সূচনা হল স্বাধীন নবাবি আমলের। ১৭০৭-এ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুর্শিদকুলি সুবে বাংলায় স্বাধীন নবাবি আমলের গোরা পত্তন করলেন। আমূল সংস্কার সাধন করলেন জমিদারি ব্যবস্থার। বাংলার নবাবি শাসন কালে প্রত্যেক নবাবের ছিল পৃথক পৃথক রাজস্ব ও রাজ্য শাসন নীতি। সুজাউদ্দিন ও সরফরাজের রাজত্বকালে বাংলার অর্থনীতি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। রাজকোষের অর্থ শূন্যতার চাপ গিয়ে পড়ে সরাসরি প্রজার উপর। এর ওপর ছিল আলিবর্দির আমলে বর্গিদের আক্রমণ। রাজস্ব আদায় করতে এসে বর্গিরা লুণ্ঠন চালাল অকাতরে। সমগ্র বাংলাকে ঠেলে দিল ধ্বংসের মুখে। এরপর সিরাজের সিংহাসনে বসার কয়েকদিনের মধ্যে শেষ হল নবাবি আমল। শুরু হল বেনিয়া কোম্পানির শাসন।

বাণিজ্য করতে আসা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পলাশীর ছোট্ট একটা যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে লাভ করলেন সুবে বাংলার শাসন ক্ষমতা। যদিও খাতায় কলমে রাজস্ব আদায়ের অধিকার পেল ১৭৬৫-তে। গবেষক গোপাল হালদার বলেছেন, "নবাবী আমল" বলতে মোটামুটি অষ্টাদশ শতককেই আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি। রাজা-রাজ্যের ইতিহাসের দিক থেকে তা নিশ্চয়ই ভুল। কারণ, সে গণনায় নবাবী আমল মাত্র পঞ্চাশ বৎসরই স্থায়ী হয়েছিল, খ্রীঃ ১৭০৭ থেকে ১৭৫৭।...নবাবী শাসনের পরিবর্তে খ্রীঃ ১৭৫৭ থেকে "ইংরাজ রাজত্বের" আরম্ভ হয়। কিন্তু তা শুধু পূর্বেকার মতো রাজা বা রাজবংশের পরিবর্তন নয়, বিদেশীয় এক বণিকশক্তির রাজ্যলাভ।'[১] এই বিদেশি বণিক শ্রেণির শাসন মোটেও সুখকর ছিল না।

পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানির হাতের পুতুল করে নবাব নিয়োজিত হয় মীরজাফর। তার শাসন কালের সবটা সময় গেছে পলাশীর যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বকেয়া পাওনা মেটাতে। কিন্তু যত টাকাই দেওয়া হোক, বেনিয়া কোম্পানির পাওনা যে শেষ হবার নয় সেকথা বুঝেছিলেন তিনি। কিন্তু তার আগেই পুনরায় বিপুল পরিমাণ টাকার বিনিময়ে নবাবের সিংহাসনে বসেন মীরকাসিম। তিনি নিজেকে কিছুটা স্বাধীন করার চেষ্টা করেছিলেন। ততদিনে কোম্পানি বিনা শুল্কে বাণিজ্যের ফরমানের সদ্ব্যবহার করে দেশীয় বাণিজ্যকে ধ্বংস প্রায় করে তুলেছে। প্রতিবাদ জানিয়ে কোন লাভ হয় না। এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যে, মীরকাসিম যুদ্ধ ঘোষণা করেন কোম্পানির বিরুদ্ধে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পুনরায় সিংহাসনে বসেন মীরজাফর। তার সময়েই ঘটে ১৭৬৫-র দেওয়ানি লাভ। একই সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী বাংলার নবাবকে করে তোলা হয় বেতনভুক। এরপর চলতে থাকে কোম্পানির শোষণ। যার চরম পরিণতি দেখি ১৭৭০-এর দুর্ভিক্ষ। না খেতে পেয়ে মারা যায় লক্ষ লক্ষ মানুষ। জনশূন্য হয়ে পরে গ্রামের পর গ্রাম। তারপরও থেমে থাকে না কোম্পানির শোষণ। বারবার নতুন নতুন জমি নীতি মানুষের জীবনে নামিয়ে আনে সীমাহীন দারিদ্র। মানুষ বেঁচে থাকার উপায় খুঁজতে থাকে। যার ফলে মধ্যযুগের দেবতা নির্ভর সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে বদল আসে। মানুষের ছোটো ছোটো নিজস্ব লোকজ ধর্মগুলি ক্রমশ কুক্ষিগত হয়ে পড়ে সমাজে উচ্চমার্গের পৌরাণিক সংস্কৃতির কাছে। এই সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় পালাবদলের অভিঘাতে প্রতিনিয়ত বদলাতে থাকে মানুষের জীবন।

এত দ্রুত বারবার ইতিহাসের রঙ বদলের ঘটনা এর আগে কখনো দেখা যায়নি। তার অভিঘাত পড়েছিল সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উপর। সময়ের বদলের ফলে এই সময়ে দেখা গেল সাহিত্যের অভিমুখ বদলের ছবিগুলি। এই সময়ের সাহিত্য সংরূপগুলির দিকে তাকালে দেখি এগুলি একদিকে ধরে রাখল মধ্যযুগের ধারাকে। অন্যদিকে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজের রূপ বদল করে শুরু হল নতুন ঐতিহ্যের নির্মাণ। মধ্যযুগের সাহিত্যের ধর্ম ও দেব নির্ভরতা ছিল এই সময়ের কাব্যে। কিন্তু সময়ের অভিঘাতে বদল ঘটেছিল ভাবনায়। লৌকিক দেবতার কাহিনিতে পুরাণ-প্রসঙ্গ জায়গা করে নিয়েছিল অনেক বেশি। লোকদেবতাকে দেওয়া হচ্ছিল পৌরাণিক রূপ। এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মঙ্গলকাব্যের জগৎ থেকে লৌকিক দেবতাকে সরিয়ে মঙ্গলকাব্যের প্রধান দেবতা হয়ে উঠল পুরাণের দেবতা অন্নদা। অর্থাৎ আর কাহিনির মধ্যে প্রবেশ নয়, সমগ্র কাব্যের জগৎ দখল করে ফেলল পৌরাণিক ও ব্রাহ্মণ্যবাদ।

সতেরো শতকের শেষ থেকেই সাহিত্যে শোনা যায় নতুন সুর। মধ্যযুগের সূচনাপর্ব থেকে মূলধারার মঙ্গলকাব্য ছিল 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গল'। এই সময়ে এসে এই দুই ধারার মঙ্গলকাব্যের গতি স্থিমিত হয়। নতুন করে লেখা হয় 'ধর্মমঙ্গল' ও 'শিবায়ন' কাব্য। ধর্মঠাকুরের পুজো হত সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণিতে। ধর্মের পুরোহিত হতেন ডোমেরা। ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় ধর্মের পুজোয় নিজেদের জড়াতেন না। মধ্যযুগের সাহিত্যের সূচনার ইতিহাসই ছিল এই নিম্নশ্রেণির দেবতাগুলিকে উপরিস্তরে তুলে আনা এবং উচ্চশ্রেণির দেবতাদের নিম্নশ্রেণির মানুষের উপযোগী করে উপস্থাপন করা। এই প্রক্রিয়ায় ধর্ম ঠাকুর কেন এতদিন ব্রাত্য ছিলেন সেটাই আশ্চর্যের। সমকালীন রাষ্ট্রীয় ও সমাজ ইতিহাসের অনুসন্ধানে মনে হয়েছে, এই সময় থেকে সমাজের সর্বক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য আগ্রাসন শুরু হয়েছিল পুরোদমে। চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদী হয়ে পড়েছিল। শুরু হয়েছিল পুরাণের দেবতাকে নিয়ে মঙ্গলকাব্য লেখার চল। এমন পরিস্থিতিতে ধর্ম ঠাকুরকেও ব্রাহ্মণ্য সমাজে স্থান দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। ধর্মের পুজোয় ডোমের স্থান ধীরে ধীরে দখল করেছিল ব্রাহ্মণ পুরোহিত। ফলস্বরূপ ব্রাহ্মণ কবির হাতে পেলাম ধর্মের আখ্যানমূলক কাব্য 'ধর্মমঙ্গল'।

অন্যদিকে মঙ্গলকাব্যের সূচনা থেকে শিব ছিল প্রধান দেবদেবীর পাশে অপ্রধান দেবতা হয়ে। মনসা, চণ্ডীর কাহিনিতে শিবের ভূমিকা ছিল সামান্যই। মুসলমান আক্রমণের অনেকটা সময় পেরিয়ে এসে সমাজ যখন অনেকটা শান্ত, তখন শিবের মতো আত্মভোলা, সংসার বিরাগী, শান্ত, দেবতাকে নিয়ে লেখা হল 'শিবায়ন' কাব্য। শিবের লৌকিক চাষি রূপ ধরা দিল কাব্যে। এছাড়াও আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতচন্দ্রের হাত ধরে দেবতাকে মানবের স্তরে নেমে আসতে দেখেছি। রামপ্রসাদের হাতে আদিশক্তি নিজের 'মা' রূপে ধরা দিয়েছে। এই দেবতার মানবায়ন শুরু হয়েছিল 'শিবায়ন' কাব্যে শিবের হাত ধরে। রামেশ্বরের শিব দেবতার আসন ছেড়ে এল বাস্তবের মাটিতে। অর্থাৎ পরিবর্তনটা শুরু হয়েছিল এই শতকের প্রথমার্ধেই। যার পূর্ণ পরিণতি দেখি সমগ্র দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে।

এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মধ্যযুগের সাহিত্য ধারার প্রবাহ ও যে রূপান্তরগুলি চোখে পড়েছে, তার সূচনা হয়েছিল এই শতকের প্রথমার্ধ থেকেই। একটি অর্বাচীন মঙ্গলকাব্যের প্রকৃত বিকাশ শুরু হয়েছিল এই সময়েই। ঘনরামের হাতে 'ধর্মমঙ্গল' এই শতকের প্রথমার্ধের প্রতিনিধি স্থানীয় রচনা। ঘনরাম 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য রচনার মধ্যে দিয়ে মঙ্গলকাব্যকে অনেক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। তিনি কাব্যের মধ্যে সমকালীন পৌরাণিক সংস্কৃতির আগ্রাসনের নিপুন ছবি একেছেন। কাব্যের মধ্যে ধর্মের আখ্যান বর্ণনা করতে গিয়ে

নিয়ে এসেছেন অনেক বেশি করে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি প্রসঙ্গ। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে ইতিহাসের প্রত্যক্ষ অভিঘাতকে সাহিত্যে স্থান দেওয়ার রীতি।

এই শতকের রাজনৈতিক ইতিহাস মানুষের জীবনকে যেভাবে প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলিত করেছিল, তার প্রভাব পড়েছিল সাহিত্যেও। ইতিহাস ও সময় অনেক বেশি করে উঠে এসেছিল এই সময়ের সাহিত্যগুলিতে। মধ্যযুগের দেবভাবনা ও দেবদেবী সমসময়ের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেই সাহিত্যে উঠে আসতে শুরু করে। 'ধর্মমঙ্গল', 'শিবায়ন', 'অন্নদামঙ্গল', 'মহারাষ্ট্রপুরাণ', 'বিদ্যাসুন্দর', 'তীর্থমঙ্গল'সহ সব মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রেই এ কথা সমানভাবে সত্য। অনুসারী সাহিত্যের ধারায় এমন প্রভূত পরিবর্তন না এলেও সময়কে এড়িয়ে যেতে পারেনি তারাও। বৈষ্ণব পদাবলি ঝুঁকেছিল পদসংকলনের দিকে। অর্থাৎ সাহিত্যও রাষ্ট্রীয় পালাবদলের সঙ্গে সমান তালে নিজেকে বদলে নিয়েছিল বারবার।

মধ্যযুগের যে সাহিত্যধারাটি এই সময়ে ক্রমবদলের মধ্যে দিয়ে স্বমহিমা বজায় রেখেছিল সেটি হল মঙ্গলকাব্য। এই সময়ে বয়সের দিক থেকে অর্বাচীন এবং উল্লেখযোগ্য মঙ্গলকাব্য হল 'ধর্মমঙ্গল'। এই শতকের প্রধান ধর্মমঙ্গল রচয়িতারা ছিলেন ঘনরাম চক্রবর্তী, দ্বিজ রামচন্দ্র, সহদেব চক্রবর্তী, প্রভুরাম মুখোপাধ্যায়, হৃদয়রাম সাউ, রামকান্ত রায়, মানিকরাম গাঙ্গুলি প্রমুখ। এদের মধ্যে প্রধান কবি ছিলেন দু'জন। ঘনরাম চক্রবর্তী ও মানিক গাঙ্গুলি। অন্যান্য কবিরা দ্বিজ রামচন্দ্র, সহদেব চক্রবর্তী, প্রভুরাম মুখোপাধ্যায়, হৃদয়রাম সাউ প্রমুখের কাব্য গতানুগতিক ধারারই অনুসারী। কবিরা কাহিনি নির্মাণ, চরিত্র সৃজন ইত্যাদিতে নতুনত্ব দেখাতে পারেননি। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনি মূলত ইতিহাস নির্ভর। এনারা কেউ নিজেদের কাব্যে সেভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি ইতিহাসের স্বাদ ও গন্ধকে। তবে তাদের কারও কারও রচনায় কাহিনি নির্মাণে রকমফের আছে। কিন্তু কবিদের ব্যক্তিগত পাণ্ডিত্য ছাপ ফেলেনি তাদের রচনায়। সেদিক থেকে ঘনরামের কাব্য ছিল ব্যতিক্রম।

মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্যের কথায়, 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ঐশ্বর্য-যুগের শ্রেষ্ঠ কবি যেমন ভারতচন্দ্র, ঘনরামও তেমনই ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঐশ্বর্য-যুগের শ্রেষ্ঠ কবি।'[২] কবির জন্ম বর্ধমান জেলার কইয়ড় পরগনার কৃষ্ণপুর গ্রামে। ১৭১১-য় তিনি কাব্যটি রচনা শেষ করেন। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র ছিলেন তার পৃষ্ঠপোষক। তার কাব্যেই বোধহয় প্রথম কাহিনির প্রধান উপাদান হিসেবে এতটা প্রভাব ফেলেছে ইতিহাস। যার চূড়ান্ত পরিণতি দেখি 'মহারাষ্ট্রপুরাণ'-এ। সেখানে ইতিহাসই কাহিনি হয়ে উঠেছে। এর পথ দেখিয়েছিলেন ঘনরাম। তার কাব্যের সৃষ্টি পালা ও হরিশচন্দ্র-লুইচন্দ্র কাহিনি রচিত হয়েছে ধর্মের মাহাত্ম্যমূলক কাহিনি হিসেবেই। গৌড়েশ্বর, ইছাই ঘোষ, মহামদ, লাউসেন প্রভৃতি চরিত্র নির্মাণে কবি দেখিয়েছেন তার নিজস্বতা। একই সঙ্গে তার কাব্যে সমকালীন সময়ের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের প্রত্যক্ষ ছাপ আঠারো শতকের সাহিত্য রচনার স্বতন্ত্র সুরটিকে ধারণ করে রেখেছে।

ঘনরাম ছিলেন রামচন্দ্রের ভক্ত। তাই কাব্যের কাহিনি নির্মাণে রামায়ণের প্রভাব সর্বত্র দেখা যায়। কেবল রামায়ণ নয়, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের প্রসঙ্গও উঠে এসেছে কাহিনির মধ্যে। এখানে কেবল কবির রাম ভক্তি নয়, সমকালীন ধর্মীয় পালাবদলের সুরটিও কাজ করেছে প্রবল ভাবে। কাহিনিতে দেখি কবি লাউসেন ও কর্পূর সেনকে নির্মাণ করেছেন কখনো রাম-লক্ষ্মণ, কখনো কৃষ্ণ-বলরাম অথবা লব-কুশের আদলে। মহামদ ও লাউসেন কাহিনিতে কংস ও কৃষ্ণ অনুসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে বহুবার। মায়ামুণ্ডু পালায় রাবণের রাম-লক্ষ্মণের মায়ামুণ্ডু তৈরি করে সীতাকে দেখানোর অনুসঙ্গ এসেছে। তার কাব্যের সর্বত্র রামায়ণের

প্রভাব দেখে আচার্য সুকুমার সেন বলেছেন, 'অনুমান করি, ধর্মমঙ্গল রচনার আগে তিনি রামায়ণ গান করিতেন।'[৩] মহাভারতের প্রসঙ্গও এসেছে বহুবার। কানাড়ার স্বয়ংবর সভা দ্রৌপদির স্বয়ংবর সভার আদলেই রচনা করেছেন কবি। লাউসেনের যুদ্ধ কাহিনি তো প্রকারান্তরে যেন মহাভারতের অর্জুন, অশ্বত্থামাসহ সমগ্র পাণ্ডবদের যুদ্ধ। এর সঙ্গে ছিল শ্রীমদ্ভাগবতের গোবিন্দ ও বৃন্দাবনের কৃষ্ণের প্রসঙ্গের অনুসরণ। লাউসেনের শিশুকালের বর্ণনাও শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণের বাল্যকালের অনুসারী।

এর বাইরেও ছিল অন্যান্য পুরাণ ও ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি-শাস্ত্রের অনুসরণ। কাব্যে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে বেদের বিধান ও বৈদিক শাস্ত্রানুযায়ী। লাউসেনের মায়ামুণ্ডু ও ইছাই ঘোষের মরদেহ দাহ হয়েছেও বৈদিক রীতিনীতি মেনেই। কাহিনির মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক শাস্ত্র, বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতির প্রাধান্য সর্বত্র। অথচ কাব্যটি ডোমেদের পূজিত ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারের কাব্য। এর আগে নিম্নশ্রেণির পূজিত দেবতার কাব্যে পৌরাণিক ও বৈদিক শাস্ত্রের এমন সর্বব্যাপী প্রভাব চোখে পড়েনি। এই শতক থেকেই এই প্রবণতা শুরু হয়। অর্থাৎ এই সময়পর্বে পুরাণের দেবতা, পৌরাণিক সংস্কৃতি ও রীতিনীতি লৌকিক দেবতার জায়গা দখল করেছিল, ঘনরামের কাব্যে তা স্পষ্ট দেখা যায়। ব্রাহ্মণ্যবাদ তখন প্রভাব বিস্তার করেছিল সমাজের সব জায়গায়। নিম্নশ্রেণির দেবতারাও তার থেকে রেহাই পায়নি। তাই ধর্মের মাহাত্ম্যমূলক কাহিনিতে জুড়ে গেছে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি কাহিনির অনুষঙ্গ। সেদিক থেকে ঘনরাম তার কাব্যে এই শতকের ধর্মীয় জীবনের পরিবর্তনকে সুচারু ভাবে কাহিনির মধ্যে তুলে ধরেছেন।

কেবল ধর্মীয় ইতিহাস নয়, সমকালীন রাষ্ট্রীয় ও সমাজ ইতিহাসও কাব্যে উঠে এসেছে অল্পবিস্তর। এই শতকের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে দেখেছি মুর্শিদকুলির সময়কাল ছিল রাষ্ট্রের কাছে অর্থনৈতিক সংস্কারের সময়। অন্যদিকে ছিল নিরীহ প্রজার উপর স্থানীয় জমিদার ও ইজারাদারদের অত্যাচার। তিনি মনসবদারি ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করলেন। হাত বদল হল অনেক জমিদারির। কঠোরভাবে জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করলেন। জনগণের উপর তিনি অতিরিক্ত কোন চাপ বাড়াননি। এই ব্যবস্থা অন্যান্য নবাব, এমনকি কোম্পানি আমলেও বজায় ছিল। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার 'History of Bengal' বইয়ে এই সময়কালের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছেন, 'For over half a century Murshid Quli and Alivardi Khan between them maintained peace, increased the wealth and trade of the century...'[৪] নবাবের শাসন ব্যবস্থায় রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল বলে আরও অনেক ঐতিহাসিক দাবি করেছেন। ঘনরামের কাব্যে 'কাঙুর যাত্রা' পালায় গৌড়রাজের মুখেও একই স্বর উচ্চারিত হয়েছে—

> দেশে নাই অনাবৃষ্টি বিঘা প্রতি আনা।
> কোন জোর জঞ্জালে ভাঙ্গিল গৌড়খানা।।[৫]

উল্টোদিকে জমিদাররা নবাবের রাজস্ব দেওয়ার তাগিদে প্রজাদের উপর নামিয়ে আনত অত্যাচার। সঙ্গে ছিল কর দিতে না পারলে রাজস্ব আদায়কারী ব্যক্তিদের শারীরিক প্রহার।

কেবল কর দিতে না পারা নয়, রাজকর্মচারীরা ব্যক্তিগত উপার্জনের জন্যে রাজার নাম করেই তারা অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করত। সমগ্র আঠারো শতক জুড়ে এটাই ছিল চরম বাস্তবতা। নবাব মহলে রাজ্যের শান্তির বার্তা প্রতিষ্ঠিত থাকলেও বাস্তবে মানুষের জীবনে সেই শান্তি ও আর্থিক সমৃদ্ধি ছিল না। ঘনরাম কাব্যে দেখিয়েছেন মহামদের সেই অত্যাচারের ছবি—

কেবা আছে অখিলের এমন অবিচারী।
মিছা অপবাদ দিয়া লুটে ঘর দ্বারি।।
.....
রাজকর লোকের তেসনি নিল বাড়া।
অতেব সকল প্রজা হোলো দেশছাড়া।।
সেনের আসনে কত আসিছে ময়না।
নীলাচল উৎকল আশ্রয়ে কত জনা।।[৬]

সেদিনের সমগ্র বাংলার চিত্রটা ছিল এমনই। নিচুশ্রেণির রাজকর্মচারীদের অত্যাচারে মানুষের জীবন ছিল অতিষ্ঠ। এই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সত্যকে কবি কাব্যে তুলে ধরেছেন।

কাহিনিতে কেবল সামাজিক সত্য নয়, প্রত্যক্ষ ইতিহাসও স্থান পেয়েছে। কাব্যে লাউসেনের যাত্রাপথ, ইছাই ঘোষের দেউল, গৌড়েশ্বরের রাজধানী প্রভৃতি বহু বিষয়েই বাস্তবকে সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত যদুনাথ সরকারের 'বর্গীর হাঙ্গামা' প্রবন্ধের আলোচনা সূত্রে যোগেশচন্দ্র রায় ঐ পত্রিকার ১৩৩৮-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বলেছেন, 'রাঢ়ে প্রবেশের দক্ষিণের পথটি বালেশ্বর দাঁতন নারায়ণগড় মেদিনীপুর চন্দ্রকোনা দিয়া ছিল। চন্দ্রকোণা হইতে রামজীবনপুর মন্দারণ উচালন বর্দ্ধমান। কিংবা মন্দারণ হইতে পূর্বদিকে গোঘাট দিয়া জাহানাবাদ উচালন বর্দ্ধমান। ২২০ বৎসর পূর্বে ধর্মমঙ্গল-প্রণেতা ঘনরাম ঘাটাল হইতে বর্দ্ধমান আসিবার এই দুই পথ লিখিয়া গিয়াছেন।...ঘনরামের লাউসেনকে পশ্চিমে গিয়া পূর্বে বাঁকিতে হইত, এখনও সেই অবস্থা।'[৭] আরামবাগের পূর্বনাম জাহানাবাদ, সেই সত্যও উঠে এসেছে কাব্যে। ঢেকুরগড়ে ইছাই ঘোষের দেউলেরও ঐতিহাসিক সত্যতা পাওয়া যায়। অমলেন্দু মিত্র 'রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর' গ্রন্থে বলেছেন, 'অজয়তীরে বর্ধমান জেলায় ঢেকুরে ইছাই ঘোষের দেউল বর্তমান। এর ১২/১৩ মাইল উত্তর পশ্চিমে বীরভূমের দুবরাজপুর থানায় যশপুরে ঢেকুরেশ্বর শিবঠাকুর বর্তমান।'[৮] প্রত্যক্ষ ইতিহাসকে সাহিত্যে স্থান দেওয়ার প্রবণতা এই সময়ে বেশি করে শুরু হয়। কবিরা কাহিনি নির্মাণ করতে গুরু করেন সমকালীন মানুষের জীবনের আলেখ্য নিয়ে। এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 'ধর্মমঙ্গলে'র প্রধান কবি মানিক গাঙ্গুলির কাব্যে এই প্রবণতা আরও বেশি করে দেখতে পাই।

মানিক গাঙ্গুলি কাব্য রচনা করেছেন সম্পূর্ণ এক ভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশে। তখন বাংলায় সম্পূর্ণভাবে চলছে কোম্পানি শাসন। দেওয়ানি লাভের পর ঘটে গেছে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। দেশের মানুষের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। অধিকাংশ মানুষের মুখে খাবার জোটে না। তার উপর প্রতিদিন কোম্পানির নতুন নতুন জমিনীতি। অন্যদিকে নগর কলকাতাকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে ধনী শ্রেণির ভোগবাদী জীবন-সংস্কৃতি। ব্রাহ্মণ্য ও পৌরাণিক রীতিনীতির চাপে পড়ে মানুষের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন হয়ে উঠেছে অসহনীয়। এমন চূড়ান্ত পালাবদলের সময়কালে কাব্য লিখেছেন মানিকরাম। তার কাব্যের রচনাকাল ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ। কবি নিজে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। সময়টাও ছিল পৌরাণিক ও ব্রাহ্মণ্যবাদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার সময়কাল। ফলত তার কাব্যের কাহিনি, চরিত্র, যুদ্ধের বর্ণনা সব ক্ষেত্রে ঘনরামের থেকে অনেক বেশি করে পুরাণ বিশেষ করে রামায়ণ-মহাভারতের অনুসঙ্গ এসেছে।

মানিকরাম কাব্যের শুরুতে দেব বন্দনা ও সৃষ্টি বর্ণনা করেছেন পুরাণ অনুসারেই। ধর্মঠাকুর নিম্নশ্রেণির ডোমেদের পূজ্য হলেও ব্রাহ্মণ্য আগ্রাসনের ছবি ফুটে উঠেছে এই কাব্যের কাহিনির ছত্রে ছত্রে। কাব্যের

প্রথম ভাগে হরিশচন্দ্র-রঞ্জাবতী-লুইচন্দ্রের কাহিনিকে পুরাণের প্রসঙ্গ দিয়ে সর্বাংশে মুড়ে দিয়েছেন। কাব্যে দেখি শালে ভর দিয়ে রঞ্জাবতীর মৃত্যু হয়। ধর্ম মায়ারূপ ধরে এসে তার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে। কবি এই অংশকে প্রাসঙ্গিক করতে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে লক্ষ্মণের বিশল্যকরণী দিয়ে প্রাণ ফিরে পাওয়ার প্রসঙ্গকে। তারপর দেখি হরিশচন্দ্র-রঞ্জাবতী ধর্মের কাছে বলি দিয়েছে লুইচন্দ্রকে। ধর্মের কৃপায় লুই জীবিত হয়ে উঠলে নিরঞ্জন তাদের ব্রাহ্মণ উপাচার করে তুষ্ট করার কথা বলে। এই ব্রাহ্মণ উপাচার ও তাদের তুষ্ট করা সবটাই ব্রাহ্মণ্যবাদ ও পৌরাণিক সংস্কৃতির প্রাধ্যান্যের ছবি। রঞ্জাবতী যখন ধর্মের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে তখন সবাই হরি ধ্বনি দিয়েছে—

উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করে সর্বজনা।
ঢাক ঢোল আদি করি বাজায় বাজনা।।[৯]

কাব্যের মধ্যে তিনি হরি, গোবিন্দ, গোলকবিহারীর সঙ্গে নিরঞ্জনকে এক করে উপস্থাপন করেছেন।

এই শতকের প্রথম থেকে এই প্রবণতা শুরু হলেও ভারতচন্দ্রের পর থেকেই লোকদেবতার কাহিনির সবটাই উপস্থাপিত হয়েছে পুরাণের আখ্যানের আলোকে। লাউসেনের কাহিনিতেও দেখি গৌড়েশ্বরের রাজসভায় হয়েছে রামায়ণ পাঠ। কালু ডোমের প্রাণ ফিরে পাওয়াকে কবি তুলনা করেছেন লক্ষ্মণের প্রাণদানের সঙ্গে। এমনকি চরিত্রগুলি পর্যন্ত রামায়ণ-মহাভারতের অনুসারী। লাউসেনকে কৃষ্ণ রূপে, মামা মাহুদ্যাকে কংস রূপে নির্মাণ করেছেন। লাউসেন মল্লশিক্ষা নিয়েছে রামভক্ত হনুমানের কাছে। কর্পূর-লাউসেনের শিশুকালকে কবি বর্ণনা করেছেন কানাই-বলাইয়ের বাল্যলীলার আলোকে। আবার যৌবনকাল রাম-লক্ষ্মণের অনুসারী। কাব্যে লাউসেন ভবানীকে যে মন্ত্রে স্তব করেছে তা কখনই লৌকিক মন্ত্র নয়। আবার ভবানীও ছিল না কোন লোকদেবতা।—

নমো নিত্যো নিদ্রারূপা নগেন্দ্রনন্দিনী।
নৃমুণ্ডমালিনী নমোহস্তু তে নারায়ণী।।
চণ্ডিকা চামুণ্ডা চণ্ডমুণ্ডা বিঘাতিনী।
নিশুম্ভনাশিনী নমোহস্তু তে নারায়ণী।।[১০]

লাউসেনের হাতে মৃত্যুকালে বাঘও একই মন্ত্রে ভবানীকে স্তব করেছে। এভাবেই আঠারো শতকের শেষে এসে মঙ্গলকাব্যের জগত দখল করেছে পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত। এর সঙ্গে সঙ্গে কাব্যে দেবতার দেবত্বকে অস্বীকারের ছবিও দেখা যায়।

রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যে শিব দেবত্ব থেকে বেরিয়ে এসে মানুষ হয়ে উঠেছে অনেক বেশি। তারপর ভারতচন্দ্রের হাতে শিব, অন্নদা, ব্যাস প্রমুখের মধ্যে দিয়ে দেবতার দেবত্ব স্খলনের ছবি দেখেছি। রামপ্রসাদ আদি শক্তিকে আরও আপন করে 'তুই' বলে ডাকলেন। এই শতকের শুরু থেকেই ধীরে ধীরে দেবতার দেবত্বকে অস্বীকারের প্রবণতা বাড়ছিল। মানিকরামের কাব্যে সেই প্রবণতার আর একটি রূপ দেখলাম। ভবানী ইন্দ্রপুত্র শ্রীধরকে অভিশাপ দেয় মর্ত্যে বাঘরূপে জন্ম নেওয়ার। এই অভিশাপে ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীধর ভবানীকে বলেছে—

মর মর ঠেঁটা মাগি চুপ করে থাক্।।
সাক্ষাতে মহেশ বসে মনে নাই লাজ।

ছি ছি তোকে ছার কপাল ছি ছি হেন কাজ।।[১১]

দেবীকে 'মাগি' সম্বোধন এর আগে প্রধান-অপ্রধান কোন মঙ্গলকাব্যে দেখা যায়নি। সময় ও সমাজের পরিবর্তনের ধারায় মানুষের জীবন বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে দেবতার উপর বিশ্বাস, রুচিবোধ, দেবতাকে সম্বোধনের পদ্ধতি। রামপ্রসাদের কথা একটু আগেই বলেছি। এখানে সেই সীমাও ছাড়িয়ে গেলেন কবি। দেবতা নেমে এল মানুষের স্তরে। সেই সময়ে এই প্রবণতা সম্ভব হয়েছিল কেবল মাত্র সমাজের বদলের ফলেই।

সমকালের এই ধর্মীয় প্রবণতার বাইরেও তার কাব্যে সমকালের আর্থ-সামাজিক চিত্রও উঠে এসেছে সমানভাবে। ঘনরামের কাব্যে যে বাস্তবতার উপস্থাপন দেখেছিলাম, সময়ের বদলের সঙ্গে সঙ্গে মানিকরামের কাব্যে সেই বাস্তবতা আরও নির্মম হয়েছে। এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মানুষের জীবনে দারিদ্র হয়ে ওঠে সীমাহীন। কোম্পানির মাত্রাছাড়া রাজস্ব নীতিতে মানুষের চাষের সব ফসল শেষ হয়ে যেত কর দিতে। সঙ্গে ছিল স্থানীয় জমিদার ও ইজারাদারদের প্রাপ্য উপরি আদায়। না দিতে পারলে চলত অমানুষিক অত্যাচার। ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল গ্রামের চাষি পরিবারগুলি। কোম্পানির বাণিজ্য নীতিতে তাঁত শিল্প পৌঁছে গিয়েছিল সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখে। এর উপরে ছিল সাহেবদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য। সবকিছু মিলিয়ে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক কাঠামো হয়েছিল ভেঙে চুরমার। রামেশ্বর, ঘনরাম, হরিদেব, ভারতচন্দ্র প্রমুখের কাব্যে এই যন্ত্রণার ছবি উঠে এসেছে। মানিকরামের কাব্যে দারিদ্রের এই ছবি ফুটে উঠেছে আরও নির্মম ভাবে।

কাব্যে শিব-দুর্গার সংসারের দারিদ্র-অন্নকষ্ট ছিল সমকালীন আর পাঁচটা বাঙালি পরিবারেরই চরম বাস্তবতা। শিব ভিক্ষা করে চাল নিয়ে এসেছে। সেই চাল একদিনেই শেষ হয়ে যায়। উপায়হীন শিব অতঃপর দুর্গাকেই দোষারোপ করে চাল ফুরিয়ে যাবার জন্যে। শিব বলে উঠে—

বিপরীত বাক্য শুনে গেল বুদ্ধিবল।
কালিকার ভিক্ষার চাল উড়ালে সকল।।
দুর্গা কন দুঃখিনীকে দোষ দিব বটে।
যার সে ভিক্ষার চাল তারে নাই আটে।।
ভিখারীর ভাগ্য পোড়ে ভাত নাই জুড়ে।
তৈল বিহীন তনুতে কেবল খড়ি উড়ে।।[১২]

শিব উপায়হীন। ভিক্ষাও জোটে না। পড়নের কাপড় নেই। নেই গায়ে মাখার তেল। সন্তানদের মুখে তুলে দেবার মতো সামান্য অন্নটুকুও নেই—

অন্যের বালক তার ক্ষীরখণ্ড খায়।
কার্তিক গনেশ মোর অন্নকে লালায়।।[১৩]

মন্বন্তরপীড়িত মানুষের এটাই ছিল দৈনন্দিন জীবনের ছবি। দুর্ভিক্ষের বহুদিন পর পর্যন্ত মানুষের অন্ন জোটেনি। ভিখারি পায়নি ভিক্ষা। তখন দেবতার কাছে মানুষের আর চাওয়া থাকে না ধন সম্পদ। ঈশ্বরী পাটনীর মতো এখানেও দেখি মানুষ চাইছে খাবার জন্যে দুটি অন্ন—

নৃপতিকে কহিবে না মাগি টাকাকড়ি।
চারী সের চাল চাই চারী গণ্ডা বুড়ি।।[১৪]

রাজার কাছে টাকাকড়ি না চেয়ে চেয়েছে খাবার জন্যে চার সের চাল। কোম্পানির শাসনকালে মানুষের জীবন বাস্তবতা তো এটাই।

কালু ডোমের ব্যক্তি পরিচয়েও দেখি তার জীবনে দারিদ্রের ছবিগুলিকে। দুবেলা কোন রকমে অন্ন জোটে তার। পরনের কাপড় নেই। নুন ছাড়া শাক, লাউ সেদ্ধ খেয়ে জীবন চলে। কালু নিজের জীবনের কথা প্রসঙ্গে বলেছে—

কপাল প্রসন্ন নয় কালে কষ্ট পাই।
কান্তা বুনে কুলা পেথ্যা তাহা বেচ্যা খাই।।
শাক লাউ সিদ্ধ করে সেও অলবন।
হাণ্ডা দশ হল্যে হয় উদর পূরণ।।[১৫]

ঘনরামের কাব্যে এমন নির্মম দারিদ্রের ছবি পাইনি। রামেশ্বরের কাব্যে শিব-দুর্গার সংসারে এমন দারিদ্রের ছবি পাই। কিন্তু তারপরেও রামেশ্বর সেখান থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন সুখী সংসার জীবনের ছবি এঁকে। যেখানে পার্বতী ভিক্ষার চাল রান্না করে স্বামী-পুত্রের মুখে অন্ন তুলে দেয়। ভিক্ষা ছেড়ে শিব চাষি হলে তার সংসারে সচ্ছলতা আসে। কিন্তু মানিকরাম শিবের দারিদ্রের ছবি আঁকার পর সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখাতে পারেননি। অন্তহীন দারিদ্রের মধ্যেই শেষ করেছেন শিব-পার্বতীর পারিবারিক জীবনের কাহিনি। সেই সময়ে পালাবদলের ধাক্কায় মানুষের জীবনের নিয়তিই ছিল এই দারিদ্র। সেখান থেকে মুক্তির কোন উপায় ছিল না। কোম্পানির শোষণে দু-মুটো খেয়ে বেঁচে থাকাই ছিল তখনকার মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য। কাব্যের মধ্যে তাই দেখতে পাই না দারিদ্র মোচনের কোন ছবি।

কোম্পানির আমলে এই দারিদ্র চরমে ওঠে ১৭৬৫-র দেওয়ানি লাভের পর। এই সময়ে কোম্পানির নতুন জমিনীতির ফলে তৈরি হয় এক স্বাধীন জমিদারশ্রেণি। যাদের কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল শুধু রাজস্বের। ধার্য করা রাজস্বের বাইরে তারা ছিল মোটামুটি স্বাধীন। তারা কোম্পানি নির্ধারিত রাজস্বের বাইরেও বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় করত নিজেদের নাগরিক সম্মান ও আভিজাত্যকে টিকিয়ে রাখতে। প্রজাদের কাছ থেকে এই বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় করার জন্য তারা অত্যাচার করত নিরীহ প্রজাদের উপর। মানিকরামের কাব্যে দেখি মাহুদ্যা রাজা হয়ে নৃশংস অত্যাচার করেছে প্রজাদের উপর। এই অত্যাচার আগের ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে থাকলেও মানিকরামের হাতে তা সময়পোযোগী হয়ে উঠেছে—

দুরাচার দুষ্টমতি অতি খলচিত্ত।
দোষ বিনে প্রজাগণে দুসখ দেও নিত্য।।
জবুল জমির জমা বেশী করে ধরে।
যে না দেয় তার সস্য গুণাকার করে।।
ক্ষেতে হলে খন্দ সে বেচে লয় সব।
বিব্রত হইল প্রজার পেয়ে আধিভব।।
দেশ ছেড়ে দেশান্তরে গ্রাম শূন্যময় হলো।।[১৬]

রাজার অত্যাচারে এভাবেই প্রজারা পালাত গ্রাম ছেড়ে শহরে। গ্রাম হয়ে পড়ত জনশূন্য। এই সময় গ্রামাঞ্চলের ইতিহাস থেকে জানা যায়, জমিদারদের অত্যাচারে মানুষ গ্রাম ছেড়ে ভিড় জমিয়েছে নগর

কলকাতায়। কলকাতার জনসংখ্যা তার ফলে বেড়ে যায় দ্রুত হারে। গ্রামের বিভিন্ন বৃত্তি, জাতির মানুষ নগরে ভিড় জমিয়ে গড়ে তোলে বিভিন্ন জাতি বা বৃত্তিভিত্তিক পাড়া। যেমন কলুটোলা, কুমোরটুলি, আহিরীটোলা ইত্যাদি। এই ছিল সেই সময়ের নিপীড়িত প্রজার জীবন ইতিহাস।

এ সবের বাইরেও মধ্যযুগের প্রচলিত কাহিনির মধ্যে উঠে এসেছে সমকালীন সমাজ ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের টুকরো টুকরো ছবি। কাব্যে গণিকাদের পালায় গণিকালয়ের বর্ণনা অনেক বাস্তবধর্মী। মানিকরামের এমন বাস্তবধর্মী বর্ণনার পিছনে সমকালের দায় ছিল বলেই মনে হয়। পলাশির যুদ্ধের পর কোম্পানির ক্ষমতায় আসার ফলে উঠতি ধনী, নব্য জমিদার, কোম্পানির সাহেব, রাজ-কর্মচারী প্রমুখের পোষকতায় নগর কলকাতায় বেশ্যালয়ের রূপ গিয়েছিল বদলে। নগরে গড়ে উঠেছিল অনেক নতুন নতুন গণিকালয়। তাদের পদ্ধতি বদলেছিল, পাল্টে ছিল খদ্দেরের প্রতি আচরণ। কাব্যে গণিকারা তাদের নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে—

পরের রমণী মোরা পিরীতকে মরি।
রসিক পুরুষ পেলে হার করে পরি।।[১৭]

একই রূপ দেখতে পাই ভবানীচরণের রচনাতেও। কবি এক্ষেত্রে যুগরুচির পরিচয় দিয়েছেন।

মধ্যযুগের সাহিত্যে এতদিন এক পুরুষের বহু পত্নী থাকার কথা পেয়েছি। কিন্তু এক স্ত্রীর বহু পতি এই প্রথম পেলাম ধর্মমঙ্গল কাব্যে। সুরিক্ষা পালায় পেয়েছি সুরিক্ষার ছয় কুড়ি স্বামীর কথা। এটি নিঃসন্দেহে মধ্যযুগের সমাজ পরিবেশে এক নতুন দিকের ইঙ্গিত। মানিকরামের কাব্যের দুটি নারী চরিত্রকে পাই যারা মধ্যযুগের সাহিত্যে চন্দ্রাবতীর পর এরাই ছিল স্বাতন্ত্র্যময়ী নারী। তারা হল কানাড়া ও লখাই ডোমনী। কানাড়ার ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই যখন কর না দেওয়ার কারণে গৌড়েশ্বর তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু রাজা মেয়ের মতকেই শেষ কথা বলে জানিয়ে দেন—

কানড়া আমার করে কাত্যায়নী পূজা।
ইচ্ছাবতী হইবেক ভাবে যায় বুঝা।।
নয় তবে হয় তার প্রতিবাদী কে।
জিজ্ঞাসিলে জানিব জেমত বলে সে।।[১৮]

এখানে কবি কানাড়াকে চন্দ্রাবতীর মত নিজের মতের পক্ষে চলার মতো করেই অঙ্কন করেছেন। শুধু এখানেই নয়, কানাড়া লাউসেনের সঙ্গে পর্যন্ত লড়াই করেছে। যুদ্ধে লাউসেন পর্যন্ত তাকে পরাজিত করতে পারেনি। এমনই বীর রমণী ছিল সে। আর এক বীর রমণী লখাই ডোমনী।

লখাই ডোমনীও এখানে অঙ্কিত হয়েছে বীর নারী চরিত্র হিসেবে। মহামদ যখন ময়না আক্রমণ করেছে তখন লখাই সবাইকে নিজেদের বীরত্বের কথা সচেতন করিয়ে যুদ্ধে যেতে বলেছে। নিজের সন্তানকে পর্যন্ত যুদ্ধে পাঠিয়েছে মৃত্যু ভয় না পেয়ে। এদের দু'জনের মধ্যে দিয়েই কাব্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নারীর স্বাতন্ত্র্য ও শক্তি। নারীর অধিকার ও শক্তি প্রতিষ্ঠার লড়াই শুরু হয়েছিল মধ্যযুগের সূচনালগ্নে মনসার হাত ধরে। তার লড়াই ছিল শিব ও চাঁদ সদাগরের পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে পুজো আদায়ের লড়াই। পুরুষ দেবতার সমান প্রাপ্য সম্মান পাওয়ার লড়াই। পরবর্তী সময়ে চণ্ডীকেও পেয়েছি এই সারিতে। মধ্যযুগের প্রথম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী মানবীকে পেয়েছি চন্দ্রাবতীর মধ্যে। অর্থাৎ সময় ও সমাজের বদলের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে

মেয়েদের অবস্থানেরও বদল ঘটেছে। এই শতকের শেষ দিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির স্পর্শে বদলেছে সমাজ। বিদেশি শাসকের নীতিতে বদলেছে মানুষের মূল্যবোধ। এমন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সুরিক্ষা, কানাড়া, লখাই এদের স্বাতন্ত্র্যময়ী নির্মাণ যথেষ্ট যুগোপযোগী বলেই মনে হয়। এভাবেই ধর্মমঙ্গল কাব্য মঙ্গলকাব্য ধারার রচনা হয়েও অনেক বেশি পরিমাণ সমকালীন রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসকে ধারণ করে এবং সমাজ পরিবর্তনের ছোটো ছোটো চিহ্নগুলিকে আশ্রয় করে আঠারো শতকের ইতিহাসের আকর রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে।

তথ্যসূত্র:

1) গোপাল হালদার, 'বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা', প্রথম খণ্ড, প্রাচীন ও মধ্যযুগ', কলিকাতা: এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৩৬৩ পৃষ্ঠা: ১৬৯।
2) আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', কলিকাতা: এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬, পৃষ্ঠা: ৬০৭।
3) সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা: আনন্দ, ১৩৯৮, পৃষ্ঠা: ১৫১
4) ঘনরাম চক্রবর্ত্তী, 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' (পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত), কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২, পৃষ্ঠা: ৫১।
5) তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৫১।
6) তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৫১।
7) 'প্রবাসী', ১৩৩৮, জ্যৈষ্ঠ, ১ম খণ্ড, ৩১শ ভাগ, ২য় সংখ্যা।
8) অমলেন্দু মিত্র, 'রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর', কলিকাতা: ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭২, পৃষ্ঠা: ৪৩।
9) মানিকরাম গাঙ্গুলি, 'ধর্মমঙ্গল' (বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত), কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯, পৃষ্ঠা: ৭৯।
10) তদেব, পৃষ্ঠা: ১৩৬।
11) তদেব, পৃষ্ঠা: ১৭৫।
12) তদেব, পৃষ্ঠা: ১৮৪।
13) তদেব, পৃষ্ঠা: ১৮৪।
14) তদেব, পৃষ্ঠা: ১৮৫।
15) তদেব, পৃষ্ঠা: ৩১০।
16) তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৩।
17) তদেব, পৃষ্ঠা: ২৩৩।
18) তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৬৯।